একটি জাতির জন্ম

মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মিঃ জিন্নাহ যে দিন ঘোষণা করলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালী হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালী জাতির। পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন, এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্ত ভাবে খন্ড বিখন্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামীর। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতম ভাবেই। মহানগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎস রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগর রূপে।

অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় নগরীর বীর জনতা সংগ্রাম করেছে বীরত্বের সাথে। সংগ্রাম করেছে এবং হানাদার, দখলদার, দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যু বাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উচু করে রুখে দাড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে বর্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাড়িয়ে প্রথমেই আমি সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতি কথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প। সৈনিকরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙ্গে দু-ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচী। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাশ করি মেট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে অফিসার ক্যাডে টরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানী বাহিনীতে।

স্কুল জীবন থেকে পাকিস্তানীদের দৃষ্টি ভঙ্গির অস্বচ্ছলতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুল জীবনেই বহুদিন শুনেছি আমার স্কুল বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই, শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানী

তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালীদের ঘৃণা করতে। বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশু মনেই। শিক্ষা দেয়া হতো তাদের বাঙালীকে নিকৃষ্টতর মানব জাতিরূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে আঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্খাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব। স্বযত্নে এই ভাবনাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো, জোরদার হলো। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্খা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্খাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনে আমি তখন করাচীতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন। পাকিস্তানী সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যম, পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমান ভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালীদের। তারা এটাকে বলতো বাঙালী জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়ে ছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলতো বাঙালী জাতির মাথা গুড়িয়ে দাও। কেউ বলতো ভেঙ্গে দাও এর শিরদাড়। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানীরা বাঙালীদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালীদের উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালীদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক রূপে বাঙালীদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নীচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালীদের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়ালো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ। যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যে আনন্দে আন্দোলিত হলাম আমরা সবাই। পর্বতে ঘেরা এ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা, বাঙালী ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাধ ভাঙ্গা আনন্দের তরঙ্গ মালা। একাডেমী ক্যাফেটেরিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়। এ ছিল আমাদের আশা আকাঙ্খার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানী ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাস ঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতর কথা কাটাকাটিতে।

মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর ফায়সালা হবে, মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালীদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লোভস হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানীর গোয়ার্তুমীর মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানী ক্যাডেট নাম তার লতিফ (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরো এখন সে লেঃ কর্ণেল) লতিফ প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশী। পাকিস্তানী আমার প্রতিপক্ষ ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতেও বাঙালী অফিসারদের অনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটি কয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখতো, অবহেলা করতো অসম্মান করতো। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালী অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোন স্বীকৃতি বা পরিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমীর ক্লাসগুলোতেও সব সময়, বোঝানো হতো, আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমন কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালী অফিসার ও সৈনিকদের সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানী অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর লোভনীয় নিয়োগ পত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিড়তো পাকিস্তানীদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালী অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভাল সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের সংগ্রামের।

এরপর হলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন দশকে সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাঙালী সংস্কৃতিকে বিকৃত করার। আমাদের জাতীয়তা খাটো করার। বাংলাদেশের বীর জনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ; আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশের-বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের

রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার একমাত্র উৎপাদন হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানিন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার সরকারী অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে। এর জবাবে তিনি বললেন, বাংলাদেশ যদি স্বয়ংভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে। পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাইছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করতো তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানী কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ান এখন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীও গর্বের বস্তু। খেম কারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়ানই লাভ করেছিল পাক বাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানী ছিল আমার আলফা কোম্পানী। এই কোম্পানী যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরীর (সাজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানীর জওয়ানরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহু সংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে ছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করে এই কোম্পানী অর্জন করেছিল সৈনিক সুলভ মর্যাদা, প্রশংসা পেয়েছিল তাদের প্রীতির। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার ও সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচু মানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটি হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই এর মত দাড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

পাকিস্তানীরা ভাবতো বাঙালীরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালী জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানীরাই বরং লেজগুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানীরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালী সৈনিকের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগেছিল অনেক।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালী পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালী জনগণের, তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালী সৈনিকদের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ। এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরি ভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালী সৈনিকের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোন বাহিনীর মোকাবিলায়ই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারী মাসে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমীতে শুরু হলো আমার শিক্ষক জীবন। পাকিস্তানীদের আমি সমর বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। আর সেই বর্বররা এই বিদ্যাকে কাজে লাগালো আমারই দেশের নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এক পাশবিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে।

সামরিক একাডেমীতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি শুধু নিকৃষ্ট অভিজ্ঞতার। সেখানে দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের কোনঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালী ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবহেলা অবজ্ঞা আর ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহন করা হতো নিম্নমানের বাঙালী ছেলেদের, ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের

নামে প্রত্যাখ্যাত করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। এই সামরিক একাডেমীতেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগ্রহীত ছিল সব ভালো বই। আমি জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশুনা করলাম ১৯৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে, বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না। এটা ছিল এক মুক্তি যুদ্ধ। ভারতের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক বুদ্ধিজীবীদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালীকে দাবিয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম, বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলী সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালী।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নে আমি ছিলাম সেকেন্ড ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল আব্দুল কাইয়ুম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজসভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো, বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তপাত। এই ভোজসভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানিন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ুম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। আর মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি এবং এর কথা থেকে আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলেছে তা জেনে শুনেই বলছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি এতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও-১ (গোয়েন্দা) লেঃ কর্ণেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কি জিজ্ঞাসা করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালী নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি, এসব খুটিনাটির প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায় ভবিষ্যতে রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগবে। গতির যে সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি বুঝতে পারি। সেই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি পশ্চিম জার্মানী যাই। এই সময়ে বাংলাদেশের সর্বত্র এর রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক এ্যাটাচী কর্ণেল জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারীগরি এ্যাটাচীর সাথে কথা বলছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচীর দৈনিক পত্রিকা ডনের একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি। এর জবাবে কর্ণেল জুলফিকার বললো, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা অন্যান্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনে বলছি। এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে।

এরপর আমি বাংলাদেশে ফিরে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড। এর কয়েকদিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী অফিসাররা মনে করতো, চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে আমি দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে পাবে, এই আশায় আমরা বাঙালী অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ান। এটার ঘাটি ছিল ষোলশহর রুওয়ানের এক আগামী দল। অন্যেরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তারমধ্যে ছিল তিনশত পুরানো ৩০৩ রাইফেল, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগন্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোম্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়ানের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়ীতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোর বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়ীগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

তারপর এলো ১লা মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দিয়ে দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এরপরদিন দাঙ্গা হলো।

বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে, এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনাহলো। এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের এনসিওরা আমাকে জানালো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম, লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙ্গালী পাড়ায়, নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙ্গালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙ্গালীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাকে হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙ্গালী হত্যা ও বাঙ্গালী দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকত ও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহাদ আমাদের মাঝে খবর আদান প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো আসতে থাকলো তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবতঃ ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহাদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরী করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীণ সিগন্যাল বলে মনে হলো আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙ্গালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনক ভাবে বিভিন্ন, গ্যারিশনে আসা যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ ষ্টেডিয়ামে ইবিআরসি'র লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম আর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন অলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্ণেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব নিতে। দুদিন পর ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনা বললাম।

এরমধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো ২১শে মার্চ জেনারেল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ফাতমীকে বললো – ফাতমী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনে ছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটলো তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হল বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে, এ আমরা ধরেই নিয়ে ছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেট অপসারনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালোরাত। ২৫ ও ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত ; রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনী ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়ানের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শবরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতেই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদ আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমেদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল, কানে কানে বললো, 'তার ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙ্গালীকে ওরা হত্যা করছে'। এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম, আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বলো ব্যাটেলিয়ান তৈরী রাখতে আমি আসি। আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী

অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে, বললাম হাত তুলো সে আমার কথা মানলো। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিলো দরজা। ক্ষিপ্র গতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাশুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্ণেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়ানে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্ণেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলালো। ব্যাটেলিয়ানে ফিরে দেখলাম, সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেঃ কর্ণেল এর আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, কমিশনের ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়াস বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়ানের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫মিনিট। ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সালে রক্ত আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবো এই দিনটিকে। স্মরণ রাখবে ভালো বাসায়। এই দিনটিকে তারা কোনদিন ভুলবে না। কোনদিন না।